❖ মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন আলোচনা ❖

ইসলাম পূর্ব আরবের ধর্মঃ
বেশীর ভাগ আরবই হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর কাছ থেকে তার পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ধর্ম গ্রহন করে। তখন পর্যন্ত তারা এক আল্লাহ্য় বিশ্বাস করলেও খুজা গোত্রের প্রধান আমর বিন লুহাই সিরিয়া গিয়ে দেখতে পান যে সেখানে লোক জন মুর্তিপুজা করছে। সেখান থেকে তিনি হুবাল নামের একটি মুর্তি নিয়ে এসে কাবায় স্থাপন করেন এবং সবাইকে তার উপাসনা করার নির্দেশ দেন। এরপর উপাসনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নামের আরো বহু মুর্তি কাবা ও তদসংলগ্ন এলাকায় স্থাপন করা হয়। হজ্জের সময় বিভিন্ন গোত্রের কাছে মুর্তি বিতরন করা হতো। বিভিন্ন গোত্র ও বাড়ীর জন্য আলাদা আলাদা মূর্তি ছিল। মক্কা বিজয়ের সময় কাবায় ৩৬০ টি মূর্তি ছিল।

সে সময় আরবে বহু কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। এর মাঝেও তারা ইব্রাহীম (আঃ) এর কিছু প্রথা যেমন কাবা তোয়াফ, হজ্জ পালন ইত্যাদি তখনও ঠিক রেখেছিল। কুরাইশরা অহংকারের কারনে আরাফাতে না গিয়ে স্বল্প সময় মুযদালিফায় অবস্থান করতো। এর প্রেক্ষিতে পরবর্তিতে আয়াত নাযিল হয়। কুরাইশরা বহিরাগতদের নির্দিষ্ট পোষাকে তোয়াফের হুকুম দেয়, অন্যথায় উলংগ অবস্থায় তোয়াফ করতে বলে। এর প্রেক্ষিতেও কুরআনের আয়াত নাযিল হয়।

ইসলাম পূর্ব আরব সমাজঃ
আবু দাউদ শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ননা করা হয়েছে যে, সে সময় আরবে ৩ ধরনের অশালীন ও চরম ঘৃন্য বৈবাহিক প্রথা প্রচলিত ছিল। মেয়েদেরকে বাজার জাত পন্য মনে করা হতো। তখন স্ত্রীর কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। দুই বোনকে এক সাথে বিয়ে করা যেত। পিতার তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করতো। তালাকের ক্ষমতা মূলত পুরুষদেরই থাকতো। তখন মেয়ে শিশুকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। ন্যায় অন্যায় বিচার না করে নিজের ভাইকে সমর্থন দেয়া হতো।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বংশ পরিচয়ঃ
হযরত ইবরাহীম (আঃ) - ইসমাইল (আঃ) - কাইদার - আরাম - আওদা - মাজ্জি - সামি - জারিহ্ - নাহিথ - মুকসার - আইহাম - আফনাদ - আইসার - দেশান - আইদ - আরাওই - ইয়ালহান - ইয়াহ্জীন - ইয়াথরাবি - সানবির - হামদান - আদদায়া - উবাইদ - আবকার - আইদ - মাখি - নাহিশ - যাহিম - তাবিখ - ইয়াদলাফ - বিলদাস - হাজা - নাশিদ - আওয়াম - ওবাই - কামওয়াল - বুজ - আউস - সালামান - হুমাইসি - আদ্দ - আদনান - আদনান - মাআদ - নিজার - মুদার - ইলিয়ায - মুদরিকাহ্ - খুজাইমান - কিনানা - আন-নাদর্ - মালিক - ফাহ্র - ঘালিব - লোই - কাব - মুর্রা - কিলাব - কুসাই - আব্দ্ মুনাফ - হাশিম - আব্দুল মুত্তালিব - আবাদুল্লাহ্ - হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)।

হাশীমঃ তিনি খুব অবস্থাপন্ন এবং উদার ছিলেন। তিনি হাজীদের খাবার ও পানি সরবরাহের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি মদিনায় আদি বিন আন-নাজ্জার বংশের মেয়ে সালমাকে বিয়ে করেন। ৪৯৭ খৃষ্টাব্দে প্যালেষ্টাইনের গাজায় তার মৃত্যু হয়, এর পর তার স্ত্রী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের জন্ম দেন।

আব্দুল মুত্তালিবঃ আব্দুল মুত্তালিব যখন বালক তখন তার চাচা আল মুত্তালিব তাকে মদিনা থেকে মক্কায় নিয়ে আসেন। জম্জম্ কূপ খনন ও হাতী আক্রমনের মত দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তার আমলে সংঘটিত হয়। হুজুরের দাদা স্বপ্নদ্রষ্টা হয়ে নির্দিষ্ট স্থানে জম্জম্ কূপ খনন করেন ও সেখানে জুরহাম গোত্রের স্বর্ণ নির্মিত তলোয়ার, মুখোশ ও হরিন পান যা দিয়ে কাবার দরজা সজ্জিত করা হয়। আবিসিনিয়ার বাদশা আব্রাহা কাবা ধ্বংস করার নিমিত্তে একবার ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে রওয়ানা দেন। যাদের সাথে ৯/১৩ টি হাতী ছিল। বাহিনী মুজদালিফা এবং মিনার মাঝামাঝি মুহাসসার নামক স্থানে পৌঁছুলে হাতী বসে পড়ে, উল্টো দিকে যায় কিন্তু সামনে যেতে চায় না। এ সময় আল্লাহ্ পাক পাখীর দ্বারা পাথর নিক্ষেপ করে ঐ বাহিনীকে ধ্বংস করেন। আব্রাহা নিজেও ফিরতি পথে মারা যায়। ৫৭১ ইংরেজী, ফেব্রুয়ারীর শেষ বা মার্চের প্রথমে, আরবী মুহর্রম মাসে এই ঘটনা ঘটে, তখন আমাদের প্রিয় নবীর জন্মের আর মাত্র ৫০ অথবা ৫৫ দিন বাকি। এই ঘটনা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষন করে, যা আল্লাহ্র ঘরের পবিত্রতা ও সত্যতারই প্রমান। আব্দুল মুত্তালিবের দশ ছেলে হলেন- আল-হারিত, আজ্-জুবাইর, আবু তালিব, আব্দুল্লাহ্, হামজাহ্, আবু লাহাব, ঘিদাক, মাকওয়াম, সফর, এবং আল-আব্বাস। আর ছয় মেয়ে হলেন- উম্মে আল-হাকিম, বার্রাহ্, আতিকাহ্, সাফিয়া, আরওয়া এবং ওমাইমা।

আব্দুল্লাহঃ ইনি আমাদের নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর পিতা। পবিত্র কাবার নামে উৎসর্গ করার জন্য আব্দুল্লাহ্র নাম নির্বাচিত হয়। আব্দুল মুত্তালিব তার পুত্রবধু হিসেবে ওয়াহাব বিন আব্দ্ মুনাফ এর মেয়ে আমিনাকে পছন্দ করেন। মক্কায় উনাদের বিয়ে হয়। এর কিছুদিন পরই আব্দুল্লাহ্ খেজুর কেনার জন্য মদিনায় গিয়ে সেখানে মারা যান। এ সময় তার বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর। আন্ নাবিঘা আল-যুদির বাড়ীতে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। বেশীর ভাগ ঐতিহাসিকের মতে হুজুর (সাঃ) এর জন্মের মাত্র ২ মাস পূর্বে উনার মৃত্যু হয়।

হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ঃ

জন্মঃ সোমবার সকাল, ৯ই রবিউল আউয়াল, ২০শে অথবা ২২শে এপ্রিল, ৫৭১ খৃষ্টাব্দে মক্কার হাশিম লেনে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) জন্মগ্রহন করেন । হুজুরের আম্মা এ সংবাদ তার দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে পাঠান । দাদা তাকে পবিত্র কাবায় নিয়ে গিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেন । সপ্তম দিনে দাদা হুজুরের মুসলমানি করান ।

শিশুকালঃ তদানিন্তন আরবের প্রথা অনুযায়ী উনাকে পালক মায়ের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । কিন্তু তিনি এতিম শুনার পর কোন মহিলাই উনাকে নিতে রাজি হয়নি । অবশেষে মা হালিমা যখন তাকে গ্রহন করেন এবং তার দুধ পান করেন তখন তিনি তার স্তনে প্রচুর দুধের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন । এরপর তার স্বামী উটের স্তন থেকেও অলৌকিক ভাবে প্রচুর দুধ দহন করেন । তিনি তখন হালিমাকে বলেন- আল্লাহ্‌র নামে বলছি সত্যি তুমি একজন সৌভাগ্যবান শিশু পেয়েছো । এভাবে চার কি পাঁচ বছর হুজুর মা হালিমার যত্নেই মানুষ হন । এর মাঝে একদিন হযরত জিব্রাইল (আঃ) এসে হুজুরের বুক চিরে তার হৃদপিন্ড বের করে তা জমজম্‌ এর পানি দিয়ে ধুয়ে তা পূর্বের মত লাগিয়ে দেন । এ ঘটনা দেখে হুজুরের খেলার সাথীরা তার মাকে খবর দেয় যে মুহম্মদকে হত্যা করা হয়েছে । এ খবর পেয়ে সবাই ছুটে এসে দেখে যে তিনি ঠিকই আছেন ।

মা আমিনার কাছেঃ উক্ত ঘটনার পর তারা মুহম্মদকে (সাঃ) তার আম্মার কাছে ফিরিয়ে দেন । ছয় বছর বয়স পর্যন্ত তিনি তার আদরেই থাকেন । মা আমিনা, হুজুর (সাঃ) ও আব্দুল মুত্তালিব, হুজুরের পিতার কবর যিয়ারতের জন্য মদিনায় যান । সেখানে তারা এক মাস অতিবাহিত করেন । এর পর ফেরার পথে মা আমিনা ভীষন অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পথিমধ্যে আবওয়া নামক স্থানে মৃত্যু বরন করেন ।

দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছেঃ দাদা তার এই এতিম নাতিকে তার নিজ সন্তানদের চাইতেও বেশী আদর করতেন । আব্দুল মুত্তালিবের একটি জাজিম কাবার পাশে বিছানো ছিল । তার সন্তানেরা এর চারিদিক দিয়ে ঘুরাঘুরি করতো কিন্তু মুহম্মদ (সাঃ) জাজিমের উপরেই নাচানাচি করতেন । দাদা প্রায়ই আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে বলতেন যে আমার নাতি একদিন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হবেন । মুহম্মদের (সাঃ) বয়স যখন ৮ বছর ২ মাস ১০ দিন তখন মক্কাতেই আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যু বরন করেন । পিতা, মাতা ও দাদার অবর্তমানে এই ছোট্ট বালকটির দায়িত্ব তখন গিয়ে পড়ে তার চাচা আবু তালিব এর উপর ।

চাচা আবু তালিবের ছায়ায়ঃ আরবে তখন প্রচন্ড খরা, গাছপালা পাতাশুন্য, কুরাইশরা আবু তালিবকে বললো চলো আমরা কাবায় গিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করি । আবু তালিব ভাতিজা মুহম্মদ (সাঃ) কে সঙ্গে নিলেন, এই ছোট বালকের মাথার উপর কালো মেঘ, তিনি কাবার দেয়াল ঘেযে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র কাছে বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন, ততক্ষনাৎ চারিদিক থেকে মেঘ এসে জমলো আর বৃষ্টি হলো । বয়স যখন ১২ বছর তিনি চাচা আবু তালিবের সাথে সিরিয়া গেলেন ব্যাবসার জন্য । এক ধর্ম জাজক সেখানে মুহম্মদকে দেখে বলেছিল- ‘‘ইনি হ’লেন সমস্ত মানবজাতির সর্দার । আল্লাহ্‌ তার কাছে ওহি পাঠাবেন যা হবে সমস্ত সৃষ্টির জন্য রহমত সরুপ ।’’ আবু তালিব বলেন তুমি তা কি ভাবে জানলে । উনি উত্তর দেন-তোমরা যখন আকাবার দিক থেকে আস তখন সমস্ত পাথর ও গাছপালা অবনত হয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছিল , যেটা তারা নবী ছাড়া অন্য কাউকে করে না । নবীজ্বীর ৮ বছর বয়স থেকে শুরু করে তার চাচা আবু তালিব মারা যাওয়া পর্যন্ত তিনি তারই একান্ত ছত্র ছায়ায় অবস্থান করেন । এই চাচার সম্মান ও প্রতিপত্তির কারনেই তার বর্তমানে কেউ কোন দিন তার গায়ে হাত লাগাবার সাহস পায়নি । তিনি চাচাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন ।

খাদিজার সাথে বিয়েঃ ২৫ বছর বয়সে হুজুর খাদিজার ব্যাবসায় চাকরী নিয়ে সিরিয়ায় যান । এ সময় খাদিজা তার সততায় অভিভূত হয়ে নিজ বান্ধবি নাফিসার মাধ্যমে উনাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন । পরে দু’জনের চাচার মধ্যে কথাবার্তার মাধ্যমে বিয়ে হয় । হুজুরের ছয় সন্তান হলেন- আল কাসিম, যয়নব, রুকাইয়াহ্‌, উম্মে কুলসুম, ফাতিমা এবং আব্দুল্লাহ্‌ । দুই ছেলে শিশু অবস্থায় মারা যান । ফাতেমা ছাড়া উনার সব মেয়ে তার জিবদ্দশাই মারা যান । হুজুরের মৃত্যুর ছয় মাস পর ফাতিমা মারা যান । উনার সব মেয়েই ইসলাম গ্রহন করেন ।

প্রথম ওহীঃ তখন তিনি আন-নূর পর্বতের হেরা গুহায় সত্যের অনুসন্ধান করতেন । সোমবার ২১শে রমজানের রাত্রি, ১০ই আগষ্ট, ৬১০ খৃষ্টাব্দ সর্বপ্রথম জিব্রাইল (আঃ) হুজুরের কাছে আসেন ও বলেন পড়, পড়, পড়

‘‘পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে । পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু । ’’ - ১-৩, সূরা আলাক ।

এই ঘটনায় হুজুর ভয় পেয়ে যান ও খাদিজার সাথে বৃত্তান্ত খুলে বলেন । খাদিজা কোন কথা না বলে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন ও হুজুরকে অভয় দেন । কোন এক পর্যায়ে হুজুর পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন জিব্রাইল তাকে বাধা দিয়ে বলেন মুহম্মদ তুমি সত্যই আল্লাহ্‌র নবী আর আমি ফেরেশ্‌তা জিব্রাইল ।

ইসলাম প্রচারঃ নবুয়তের ২৩ বছরের মধ্যে মক্কায় ১৩ বছর ও মদিনায় ১০ বছর । মক্কার প্রথম ৩ বছর গোপনে দাওয়াত দেন । ৪র্থ বছর থেকে ১০ম বছর পর্যন্ত মক্কায় প্রকাশ্যে দাওয়াত দেন । ১০ম বছরের শেষ থেকে হিজরতের আগ পর্যন্ত মক্কার বাইরে ইসলামের প্রচার চালান ।

প্রথম ইসলাম গ্রহনকারীঃ খাদিজা, জাইদ বিন হারিথাহ্, আলি বিন আবি তালিব ও আবু বকর আস-সিদ্দিক ইনারা প্রথম দিনই আল্লাহ্ ও তার রসূলের উপর ঈমান আনেন । এর পর হযরত আবু বকরের দাওয়াতে যারা মুসলমান হন তারা হ'লেন- উসমান, জুবাইর, আব্দুর রহমান, সাদ, জুহ্রি এবং তালহা । এর পর যোগ দেন বিলাল, উবাইদাহ্, আবু সালামাহ্, আল-আরকাম, কুদামা, আব্দুল্লাহ্, আব্দ্ মুনাফ, সাইদ বিন জাইদ, ফাতিমা (ওমরের বোন), আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ ও আরো অনেকে মোট প্রায় ৪০ জনেরও বেশী ।

নামাযঃ ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় সকালে দুই ও সন্ধ্যায় দুই রাকাত নামায ছিল । হুজুর অবশ্যই এ নামায পড়েছেন । তবে সে নামাযের ফরজের ব্যাপারে মতভেদ আছে । মেরাজের পরই ৫ ওয়াক্ত নামায নবীর উম্মতের উপর ফরজ হয় ।

কাফেরদের পাশবিক অত্যাচারঃ

বিলালঃ ইনি ইসলাম গ্রহন করার পর তার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালান হয় । তার গলায় রশি দিয়ে তাকে রাস্তার উপর টেনে নেওয়া হতো । কখনো উত্তপ্ত বালুর উপর পাথর চাপা দিয়ে তাকে শুইয়ে রাখা হতো । কখনো বা কয়েকদিন তাকে খাবার দেওয়া হতো না । কোন অত্যাচারই তাকে এক আল্লাহ্র বিশ্বাস থেকে এতটুকু সরাতে পারেনি । একদিন এমনি অত্যাচারের সময় আবু বকর তাকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দেন ।

সুমাইয়াঃ ইনি ইসলামের প্রথম মহিলা শহীদ । শত অত্যাচারের পরও যখন তাকে তার বিশ্বাস থেকে বিন্দু মাত্র টলান সম্ভব না হয় তখন আবু জেহেল নিজ হাতে বেয়নেট দিয়ে তার জান বের করে দেয় ।

আম্মারঃ ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ইনি উনার আম্মা সুমাইয়া ও আব্বা ইয়াসির সহ ইসলাম গ্রহন করেন । এরপর শুরু হয় অবর্ননীয় অত্যাচার । কাফেররা এর পূর্বেই তার মাতাপিতাকে শহীদ করে দেয় । পাশবিক অত্যাচারের কোন এক মূহুর্তে তিনি কাফেরদের কথায় সায় দিতে বাধ্য হন যদিও তখনও তার হৃদয় শুধু এক আল্লাহ্র উপরই বিশ্বাস রাখে । এ মূহুর্তে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়-

''যার উপর যবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহ্তে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরির জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহ্র গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি ।'' - ১০৬, সূরা নাহ্ল ।

এরপরও আবু ফাকীহ্, খাব্বাব ও আরো বহু নাম না জানা সাহাবিদের উপর চলেছে নরপিশাচদের বর্বর নির্যাতন । নির্যাতনের ভয়াবহতা দেখে হুজুর (সাঃ) নও মুসলিমদেরকে তাদের ইসলাম গ্রহনের কথা গোপন রাখতে বলতে বাধ্য হন । নবুয়তের ৪র্থ বর্ষে হুজুরের সাথে এক বৈঠকের পথে যাবার সময় মূর্তিপূজকরা সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে নানাভাবে উত্তেজিত করলে তিনি তাদেরকে ইচ্ছামত মারধর করেন । ইসলামের ইতিহাসে কাফেরদের বিরুদ্ধে এটাই প্রথম রক্তপাত ।

কুরাইশদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মুসলমানরা যখন (নবুয়তের ৫ম বছর) আবিসিনিয়ায় যেতে লাগলো তখন কাফেররা আবু তালিবকে ধরলেন তিনি যেন তার ভাতিজাকে তার ক্রিয়াকান্ড বন্ধ করতে বলেন । তিনি হুজুরের সাথে এ ব্যাপারে কথা বললে তিনি উত্তরে বলেন, ও আমার চাচা ! আমি আল্লাহ্র নামে সপথ করে বলছি, তারা যদি আমার এক হাতে সূর্য ও অন্য হাতে চন্দ্রও এনে দেয় তবু ইনশাআল্লাহ্ আমি আমার পথ হতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হবো না । এরপর একদিন কাবা প্রাঙ্গনে উক্বা বিন আল মুআইত হুজুরের গলায় কাপড় পেঁচিয়ে টানাহেঁচড়া করে, পরে আবু বকর এসে হুজুরকে উদ্ধার করেন ।

চাচা হামজা (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহনঃ নবুয়তের ৬ষ্ঠ বছরে এক দিন হুজুর (সাঃ) সাফা পাহাড়ে বসে আছেন । হঠাৎ আবু জেহেল সেখানে এসে হুজুরের মাথায় পাথর মেরে রক্ত বহিয়ে দেন । এদিকে হামজা (রাঃ) স্বীকার শেষে সে পথেই ফিরছিলেন । পথিমধ্যে তিনি এক মহিলার কাছ থেকে উক্ত ঘটনা জানেন । ভাতিজার এই অসহায় অবস্থা তার মনে এক ক্রিয়ার সৃষ্টি করে ও আল্লাহ্ তার মনকে ঘুরিয়ে দেন ও তিনি ইসলাম গ্রহন করেন । হামজার ইসলাম গ্রহন কুরাইশদেরকে দারুন ভাবে দূর্বল করে ফেলে ।

হযরত ওমর এর ইসলাম গ্রহনঃ নবুয়তের ৬ষ্ঠ বছর, ওমর তখনও ইসলামের ঘোরতর শত্রু । এরই মাঝে হুজুর দোয়া করেছেন- আল্লাহ্ ওমর আর জেহেলের মধ্যে যাকে তোমার পছন্দ তাকে দিয়ে তুমি ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি কর । হামজার ইসলাম গ্রহনের ৩ দিন পর খোলা তলোয়ার হাতে ওমর ছুটেছেন হুজুরকে কতল করতে । পথিমধ্যে নিজ বোন ও ভগ্নিপতির ইসলাম গ্রহনের সংবাদে তাদের মারধর করার পর তাদেরই মুখে কুরআনের আয়াত

‘‘আমিই আল্লাহ্ আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই । অতএব আমার এবাদত কর এবং আমার স্মরনার্থে নামায কায়েম কর ।’’ - ১৪, সূরা তোয়াহা ।

শুনে তিনি বলতে থাকেন আমাকে মুহম্মদের কাছে নিয়ে চল । তখনই তিনি হুজুরের কাছে ইসলাম গ্রহন করেন । ওমরের মত বীরের ইসলাম গ্রহন ইসলামের শক্তিকে আরো বাড়িয়ে দেয় । ওমরই প্রথম প্রকাশ্যে কাবায় গিয়ে নামায আদায় করেন, কোন জালিমের সাহস হয়নি তাকে কিছু বলার ।

কাফেরদের প্রলোভনঃ হামজা ও ওমরের ইসলাম গ্রহনের পর কুরাইশরা হুজুরের সাথে সমঝোতায় আসতে চাইলো । তারা বললো- তুমি যত ধন সম্পদ চাও দেওয়া হবে, তোমাকে কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী বানিয়ে দেওয়া হবে, তুমি রাজত্ব চাইলে আমরা তোমাকে রাজা বানাবো যদি তুমি তোমার পথ থেকে সরে দাঁড়াও । এর উত্তরে হুজুর শুধু আয়াত ১-৫, সূরা হা-মীম সেজদাহ্ তেলাওয়াত করে শুনান । সেদিন এ আয়াত শুনে কাফেরদেরও অনেকের অন্তর নাড়া দিয়ে ওঠে । মুহম্মদকে যে কোন ভাবেই পারা যাবে না তা তারা সেদিন বুঝতে পেরেছিল ।

আবু তালিবের মৃত্যুঃ ৪০ বছর ধরে আবু তালিব হুজুরের একনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন । শৈশবে তিনি ছিলেন অবলম্বন, কৈশরে অভিভাবক আর পরবর্তিতে দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা ব্যুহ্য। রজব মাস, নবুয়তের ১০ম বছর, চাচা অত্যন্ত অসুস্থ, তার ঘরে আবু জেহেল আর আব্দুল্লাহ্ বিন উমাইয়া, হুজুর ঘরে ঢুকলেন, বললেন- ‘‘চাচা আমার, একবার সম্মতি দেন যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই, বাকি আমি আল্লাহ্র কাছে স্বাক্ষী দিব (আপনি বিশ্বাসী) ।’’ আল্লাহ্র নবী বারবার অনুরোধ করতেই থাকেন, কিন্তু চাচা শেষ পর্যন্ত তা গ্রহন করেননি । রসূল (সাঃ) তখন বলেন আমি আপনার জন্য ক্ষমা চাইতেই থাকবো যতক্ষন আল্লাহ্ আমাকে বারন না করেন । তারপর এই আয়াত নাযিল হয়-

‘‘নবী ও মুমিনদের উচিত নয় মুশরেকদের মাগফেরাত কামনা করা, যদিও তারা আত্মীয় হোক- একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা দোযখী ।’’ - ১১৩, সূরা আত্-তাওবাহ্ ।

স্ত্রী খাদিজার মৃত্যুঃ চাচা মারা যাওয়ার মাত্র ২ মাস পর রমজান মাস, নবুয়তের ১০ম বছরে হুজুরের ২৫ বছরের সঙ্গী ইন্তেকাল করেন । তখন খাদিজার বয়স ৬৫ আর হুজুরের ৫০ । তার মৃত্যুতে হুজুর নিদারুন কষ্ট পান । এক পর্যায়ে তিনি বলেন- ‘‘সে তখন আমার উপর বিশ্বাস এনেছে যখন অন্য কেউই আনেনি । সে তখন ইসলাম গ্রহন করেছে যখন সবাই আমাকে অবিশ্বাস করেছে । যে তখন আমাকে সার্বিক যাহায্য করেছে যখন কেউ যাহায্য করার ছিল না । শুধু সেই আমাকে সন্তান দিয়েছে ।’’

আল মিরাজঃ মদিনায় হিজরতের ১৬ থেকে ১২ মাস পূর্বের ঘটনা । হযরত মুহম্মদ (সাঃ), জিব্রাইল (আঃ) এর সাথে বুরাকে চড়ে কাবা থেকে জেরুজালেমের মসজিদ আল আক্সায় যান । সেখানে নামায আদায় করার পর তিনি আবার বুরাকে চড়ে আল্লাহ্র আরশের দিকে রওনা দেন । এর পর পথিমধ্যে প্রথম আসমানে আদম (আঃ), দ্বিতীয় আসমানে ঈসা (আঃ), তৃতীয় আসমানে ইউসুফ (আঃ), চতুর্থ আসমানে ইদ্রিস (আঃ), পঞ্চম আসমানে হারুন (আঃ), ষষ্ঠ আসমানে মুসা (আঃ) ও সপ্তম আসমানে ইব্রাহীম (আঃ) এর সাথে দেখা হয় । এ সময় সমস্ত নবীগন উনাকে শেষ নবী হিসেবে স্বীকৃতি দেন । এর পর উনি সিদরাতুল মুনতাহার এ যান সেখান থেকে উনাকে বায়তুল মামুর দেখানো হয় যেটা কাবার অনুরুপ, যাকে কেন্দ্র করে প্রতি দিন ৭০ হাজার ফেরেস্তা তোয়াফ করছে । সে সময় আল্লাহ্ পাক মানুষের জন্য ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন, মুসা (আঃ) এর পরামর্শে হুজুর (সাঃ) তার উম্মতের কষ্টের কথা চিন্তা করে আল্লাহ্র কাছ থেকে এই নামাযকে ৫ ওয়াক্তে কমিয়ে আনেন । হুজুরকে সেদিন বেহেশতী ও দোযখীদেরকেও দেখানো হয় । তিনি মিরাজ থেকে ফিরে এসে ঘটনা বর্ননা করলে কাফেররা সমালোচনার নূতন প্লট পেয়ে সোজা আবু বকরের কাছে গিয়ে ঘটনা তুলে ধরে । আবু বকর ততক্ষনাৎ মিরাজের সত্যতার স্বাক্ষ্য দেন । এই অন্ধ সমর্থনের পরই হযরত আবু বকর কে ‘সিদ্দিক’ খেতাবে ভুষিত করা হয় ।

মদিনায় হিজরতঃ কাফেরদের অবিরত নির্যাতনের ফলে মুসলমানদের বাধ্য হয়ে হিজরত করে মদিনায় চলে যেতে হয় । নবী করিম (সাঃ), আবু বকর ও আলী তখনো মক্কায় । এদিকে কাফেররা সম্মিলিত ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে হুজুর (সাঃ) কে তারা মেরে ফেলবে । হুজুরও প্ল্যান করে ফেলেছেন মদিনায় হিজরত করবেন, এ ব্যাপারে আবু বকরের সাথেও তার পরামর্শ হয়ে গেছে । ওদিকে জিব্রাইল এসেছেন হুজুরের কাছে কাফেরদের পরিকল্পনা ফাঁস করে দিতে ও হিজরতের ব্যাপারে আল্লাহ্র অনুমতি পৌছাতে । কুরআনের আয়াত নাযিল হলো-

‘‘আর কাফেররা যখন পরিকল্পনা করলো আপনাকে বন্দি করার, মেরে ফেলার বা বিতাড়িত করার, তখন আল্লাহ্ও পরিকল্পনা করলেন আর আল্লাহ্ই হলেন সর্বোৎকৃষ্ট পরিকল্পনাকারী ।’’ - ৩০, সূরা আল-আনফাল ।

কাফেররা হুজুরের বাড়ী ঘেরাও করে রেখেছে উনি বের হলেই মেরে ফেলবে । হুজুর নিজের বিছানায় আলীকে শুইয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন । অভয় দিলেন আল্লাহ্ তোমার হেফাজত করবেন, ওরা তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা । ২৭শে সফর, নবুয়তের ১৪ তম বছর, ১২/১৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ ইংরেজী সন হুজুর দরজা খুলে এক মুষ্টি ধুলো ফু দিয়ে উড়িয়ে দিলেন, কাফেরদের চোখে তারা কিছুই দেখলো না হুজুর সামনে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন ।

সোজা আবু বকরের বাসায়, তারপর কাফেররা ধাওয়া করায় তারা থাওর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন । শুক্র, শনি ও রবিবার রাত উনারা এখানেই কাটান । সোমবার ৮ই রবিউল আউয়াল নবুয়তের ১৪ বছর, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ৬২২ খৃষ্টাব্দ আল্লাহ্‌র নবী কুবা এসে পৌঁছুলেন । প্রতিটি আনসার আন্তরিক ভাবে নিজের ঘরে নবীজ্বীকে মেহ্‌মান বানাতে প্রস্তুত । উনার উট আল্লাহ্‌ কর্তৃক পরিচালিত ছিল, উটটি যেখানে এসে বসলো সেখানেই হলো মসজিদে নববীর নির্দিষ্ট স্থান । আবু আইউব আল আনসারী হলেন সেই ভাগ্যবান যার ঘরেই হুজুর সর্বপ্রথম মেহ্‌মান হলেন ।

বদরের যুদ্ধঃ হুজুর ছিলেন প্রধান সেনাপতি । মুহাজিরদের পতাকা ছিল আলীর হাতে আর আনসারদের ছিল সাদ বিন মুআদ এর হাতে । যুদ্ধের পূর্ব রাত্রি সারা রাত হুজুর নামায পড়েন ও দোয়া করেন । শুক্রবার, ১৭ই রমজান, ২ হিজরী, প্রচন্ড যুদ্ধ আরম্ভ হলো । মুসলমানদের জয়ে আল্লাহ্‌ সাহায্য করলেন । এক মুষ্ঠি ধুলো হুজুর ছিটিয়ে দিলেন শত্রু পক্ষের দিকে আর তারা হেরে গেল । আল্লাহ্‌ বলেন-
‘‘আর তুমি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ্‌ স্বয়ং যেন ঈমানদারদের প্রতি এহ্‌সান করতে পারেন যথার্থভাবে । নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ শ্রবণকারি ; পরিজ্ঞাত ।’’ -১৭,আনফাল

সেদিন ফেরেশতারা মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করে । এ যুদ্ধে দুজন বাচ্চা আবু জেহেলকে ধরাশায়ী করে দেয় । জেহেলের শেষ মূহুর্তে আব্দুল্লাহ্‌ বিন মাসউদ তাকে জিজ্ঞেস করেন ‘‘দেখেছিস আল্লাহ্‌ তোকে কি ভাবে লাঞ্ছিত করেছেন?’’ উত্তরে যে বলে আমি লাঞ্ছিত নই, আমার লোকেরাই আমাকে হত্যা করেছে । তারপর সে জানতে চায় যুদ্ধে কারা জিতেছে, মাসউদ বলেন ‘আল্লাহ্‌ ও তার রসূল’ । এখানেই জেহেলের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে । এই যুদ্ধে ১৪ জন মুসলমান শহীদ হন,অপর পক্ষে ৭০ জন কাফের মারা যায় ও সম সংখ্যক যুদ্ধ বন্দি হিসেবে ধরা পড়ে । বিজয়ের সংবাদ মদিনায় পৌঁছার পূর্বেই হুজুরের মেয়ে ও ওসমানের স্ত্রী রুকাইয়া সমাধিস্থ হন । বদরের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে যুদ্ধের আইন সংক্রান্ত বহু আয়াত নাযিল হয় । এ বছরই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ফরজ রোজার ও যাকাতের হুকুম আসে ।

ওহুদের যুদ্ধঃ বদরের শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি মুছার জন্য মক্কার কাফেররা উঠে পড়ে লেগেছিল । আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে তারা ৩ হাজার সুসোজ্জিত সৈন্য নিয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল । তারা যখন আল আবওয়া নামক স্থানে পৌঁছে তখন সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ প্রস্তাব করেছিল হুজুরের আম্মার কবর উঠিয়ে ফেলার জন্য, কিন্তু এর ভয়াবহতা লক্ষ্য করে সেনাপতি এর অনুমতি দেয় নাই । শুক্রবার ৬ই সাওয়াল, ৩ হিজরী এ দল ওহুদের নিকট আইনাইন গিয়ে পৌঁছে । শুক্রবার আসরের নামাযের পর আবু বকর ও ওমর হুজুরকে যুদ্ধের পোষাক পরতে সহায়তা করেন । মুসলমানদের পক্ষে মাত্র ১ হাজার সৈন্য আর যুদ্ধ উপকরণও অত্যন্ত নগন্য । হুজুর দলকে ৩ ভাগে ভাগ করলেন-মুহাজিরিন, আনসারদের ২- আউস ও খাজরাজ । দুর্বল ও বয়সে ছোট যারা এসেছিলেন তাদেরকে বাদ দেওয়া হলো । কিন্তু পারদর্শিতা ও হিম্মত প্রদর্শনের কারনে পরে রাফি ও সামুরা নামের দুই বাচ্চাকে নেওয়া হয় । পথিমধ্যে আব্দুল্লাহ্‌ বিন উবাই বিশ্বাস ঘাতকতা করে ও ৩০০ সৈন্য নিয়ে পিছপা হ’য়ে যায় । এ সম্পর্কে সূরা আল ইমরানের ১৬৭ আয়াত নাযিল হয় । এখন মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো মাত্র ৭০০ । সবাই যুদ্ধ ক্ষেত্রে গেলেন, হুজুর আব্দুল্লাহ্‌ বিন জুবাইর এর নেত্রিত্বে ৫০ জনের এক দলকে মুসলমানদের অবস্থানের দক্ষিন পূর্ব কোনে একটা খালের পাশে অবস্থান দিলেন । নির্দেশ দিলেন যে কোন অবস্থাতেই যেন তারা তাদের অবস্থান থেকে না নড়েন । তিনি আরো বললেন আমরা যেন আমাদের পিছন দিক অর্থাৎ তোমাদের দিক থেকে কোন ক্রমেই আক্রান্ত না হই । এরপর ডান দিকের দায়িত্ব দিলেন আল মুনধিরকে, বাম দিকে আজ জুবাইরকে ও সম্মুখ ভাগের প্রধান এবং দূর্ভেদ্য দল গঠন করলেন তিনি নিজে ।

৭ই সাওয়াল, ৩হিজরী যুদ্ধ ক্ষেত্র রেডি । শত্রু দ্বারা আক্রান্ত না হ’লে আক্রমন করতে নিষেধ করলেন হুজুর । নিজ তলোয়ার বের করে তিনি বললেন কে এই তলোয়ার নেবে, অনেকেই তা চাইলেন কিন্তু হুজুর তা আবু দুযানাকে দিলেন । আবু সুফিয়ান চাল চাললো, আনসারদের উদ্দেশ্যে বললো আমরা আমাদের কাজিনদের যাথে যুদ্ধ করতে এসেছি, তোমরা সরে দাঁড়ালে আমরা তোমাদের কিছু বলবো না । তাদের কোন ফন্দি ফিকিরই কোন কাজে আসলো না । যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল । আজ জুবাইর দুদ্ধর্ষ আবি তালহাকে ধরা শায়ী করে দিলেন । এর পর দুই দলের সম্মুখ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল । মুসলমানদের জয়জয়কার অবস্থা, প্রত্যেকেই বীরত্বের পরিচয় দিলেন । আবু দুযানা সুযোগ পেয়েও হুজুরের তলোয়ার হিন্দের উপর চালালেন না । সুদক্ষ বর্শা চালক দাশ ওয়াহ্‌সী নিজ মুক্তি পনের লোভে হুজুরের চাচা হামজা (আসাদুল্লাহ্‌) কে আড়াল থেকে হত্যা করলো । হানজালার লক্ষ্য বিচ্যুত হওয়ায় আবু সুফিয়ান বেঁচে গেল আর হানজালা শহীদ হলেন । যুদ্ধ যখন চরমে, উপায়ান্তর না দেখে কাফেররা পিছিয়ে গেল, মুসলমানদের বিজয় সমাসন্ন ।

নিশ্চিত বিজয় দেখে আব্দুল্লাহ্‌ বিন জুবাইর ৪০ জন সৈন্যকে অগ্রে যাবার অনুমতি দিলেন, দূর্বল হয়ে গেল পিছন দিক, অমান্য হলো রসূলের আদেশ, কাফেরদের দূর্বার আক্রমন আসলো পিছন থেকে । যুদ্ধের ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো মুসলমানরা । গুজব রটিয়ে দেওয়া হলো মুহম্মদ মারা গেছে । দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হতভম্ব সবাই । একজন বললো মুহম্মদ মারা গেলে তো তার আগে ওহি আসা শেষ হতো অতএব তিনি মরেননি । মৃত্যু সংবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ার পর আবার সবেগে আক্রমন শুরু হলো । কাফেরদের লক্ষ্য হলো মুহম্মদ । আবু বকর, ওমর ,আলী, তালহা, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, আবু দুজানা, মুযাব, সাহ্‌ল,মালিক আমারা, নুযাইবা,কাতাদা ও হাতিব হুজুরের চারিদিকে

প্রতিরক্ষা বুহ্য গড়ে তোলেন। চরম মূহুর্তে তালহা এবং সাদ কেবল হুজুরের পাশে, তারা বহু চেষ্টা করে কাফেরদের প্রতিহত করেন । এর মাঝেও উৎবাহ্ একটি পাথর ছুড়ে মারে যাতে হুজুরের দাঁত মোবারক পড়ে যায়, আব্দুল্লাহ্ বিন কামিয়া তার তলোয়ার দিয়ে উপর্যুপুরি হুজুরের ঘাড়ে আঘাত করতে থাকে । এই যুদ্ধে তালহার গায়ে উনচল্লিশটি আঘাত লাগে , এতে তার হাত অচল হয়ে যায় । হুজুর বলেন কেউ যদি জীবন্ত শহীদকে দেখতে চাও তবে তালহাকে দেখে নাও । আবু বকর ও উবাইদা বিন আল জাররাহ্ হুজুরের জখমে ব্যান্ডেজ লাগান । উবাইদা হুজুরের গালে বসে যাওয়া হেলমেটের দুটো রিং নিজের দাঁত দিয়ে টেনে তোলেন, এ সময় তিনি তার দাঁত হারান । মালিক বিন শিনান হুজুরের গাল থেকে রক্ত চুষে নেন । মাসুদ বিন উমাইর এর হাতে পতাকা ছিল, তার ডান হাত কেটে গেলে তিনি বাম হাত দিয়ে পতাকা ধরেন, সে হাত কেটে গেলে তিনি গলা দিয়ে ঝান্ডা উন্নত রাখেন । এর পর ইবনে কামিয়া তাকে হত্যা করে ঘোষনা করে যে, সে হুজুরকে হত্যা করেছে । এক পর্য্যায়ে উবাই বিন খল্ফ্ হুজুরকে হত্যা করতে যায়, সে সময় হুজুরের একটি তীর তার গলায় সামান্য আঁচড় দিয়ে যায়, এতে সে অসহ্য যন্ত্রনা অনুভব করে, বলতে থাকে মুহম্মদ আমাকে মক্কাতেই বলেছিল যে, সে আমাকে হত্যা করবে, সে যদি আজ আমাকে থুথুও দিত তবু আমি মরে যেতাম, মক্কা ফেরার পথে সত্যি সত্যি তার মৃত্যু হয় । হুজুরের জীবন নাশের সব চেষ্টা ব্যার্থ হবার পর শত্রু মক্কা ফেরত যাবার ইচ্ছায় পিছু হটতে শুরু করে, যে সময় তারা মৃত মুসলমানদের কান, নাক, লিংগ, পেট ইত্যাদি কেটে দেয় । হিন্দ হামজার কলিজা বের করে চিবায় । উম্মে আইমান এক মুসলমান মহিলা, আহতদের পানি পান করাতে গেলে হিব্বান বিন আল আরকা তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করে, তিনি পড়ে যান ও তার কাপড় উঠে যায়, এ দেখে তারা হাসতে থাকে । সাদ এর প্রতি উত্তর দেন । যুদ্ধ শেষে জখমের যন্ত্রনা নিয়েও হুজুর পাক বসে বসে নামাযের ইমামতি করেন ।

আল উসাইরিম ইসলাম গ্রহন না করেই মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করেন ও মরার পূর্ব মূহুর্তে ঈমান আনেন । যদিও তিনি কোন দিনই নামায পড়েননি তবু তিনি বেহেশতের বাসিন্দা বলে হুজুর মন্তব্য করেন । কাজমান প্রতিহিংসার বসবর্তী হয়ে যুদ্ধ করেন, এবং যখমের যন্ত্রনা বেড়ে গেলে তিনি আত্মহত্যা করেন, তিনি আগুনের বাসিন্দা বলে হুজুর মন্তব্য করেন ।

শহীদদের দাফনঃ শহীদদের ধোয়ানো হয়না । তাদের যুদ্ধ পোষাক খুলে এক কবরে ২-৩ জন করে মাটি দেওয়া হয় । হানজালার দেহ পাওয়া যাচ্ছিল না, পরে তার দেহ পানির পাশে পানি ঝরন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় । হুজুর বলেন তাকে ফেরেশতারা গোসল দিয়েছে । তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে জানা যায় তিনি ফরজ গোসলের সময় না পেয়ে যুদ্ধে চলে এসেছিলেন । হুজুর চাচা হামজার কাছে গিয়ে তার অবস্থা দেখে খুব কষ্ট পান, উনার বোন সাফিয়া ভাইকে দেখতে আসলে উনি নিষেধ করেন, কিন্তু তবু তিনি দেখেন ও দোয়া করেন । এখানে হুজুর বেশ কান্না করেন । হামজার কাফনের কাপড় ছোট ছিল বলে পায়ের দিকে আল-ইধখির গাছ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল । হুজুরের ইচ্ছা অনুযায়ী হামজা ও আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শকে এক কবরে রাখা হয় । আজও তাদের কবর ওহুদ প্রান্তরে বর্তমান ।

শনিবার , ৭ই সাওয়াল, ৩ হিজরী নবী করিম (সাঃ) বাড়ী ফেরেন ও ফাতেমাকে তলোয়ারের রক্ত ধুতে বলেন । এই যুদ্ধে ৭০ জন মুসলমান শহীদ হন । কাফেরদের নিহতের সংখ্যা ২৪ অথবা ৩৭ । এই যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে যদিও কাফেররা অগ্রগামী ছিল এবং বহু সংখ্যক মুসলমানকে শহীদ করতে সক্ষম হয় তবুও তাদেরকে বিজয়ী বলা যায় না । কেন না তারা মুসলমানদের ক্যাম্প দখল করতে ব্যার্থ হয়, তারা কোন যুদ্ধবন্দী বা গনিমতের মালও দখল করতে পারেনি, মুসলমানদের আগেই তারা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে, মদিনা খুব কাছে হওয়া স্বত্বেও তারা সেখানে হামলা করতে সাহস করেনি । এমতাবস্থায় যুদ্ধে দুপক্ষেরই হার জিত ছিল বলে ধরে নেওয়া যায় । এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সূরা আল-ইমরানের প্রায় ৬০ টি আয়াত (১২১-১৭৯) নাযিল হয়, যাতে মুসলমানদের অনেক শিক্ষনীয় আছে ।

আল আহ্যাবঃ সাওয়াল-জিলকদ, ৫ হিজরী । ইহুদিদের নেতৃবৃন্দ ও বনি নাদিরদের কিছু মক্কানদের সাথে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি অভিযানের পরিকল্পনা করে । এই অভিযান ঠেকানোর জন্য মুসলমানরা দীর্ঘ খাল খননের সিদ্ধান্ত নেয় । এই খাল খননের সময় হুজুর (সাঃ) দলবল নিয়ে ভূক্ষা ছিলেন । হুজুরের কষ্ট দেখে যাবির বিন আব্দুল্লাহ্ তার ঘরে ভেড়া জবাই ক'রে ও রুটি বানিয়ে গোপনে হুজুরকে ডাকে, কিন্তু হুজুর পূরা দলের ১ হাজার জনকেই দাওয়াত দিয়ে যাবির এর বাড়ী নিয়ে যান, সেখানে সবাই পেট পূরে খাবার পরও খাবার পূর্বের সমানই থেকে যায় । আর একবার গর্ত খুড়তে একটি বড় পাথর পাওয়া যায়, হুজুর কোদাল দিয়ে আঘাত করলে সেখান থেকে আলোকচ্ছটা আসে ও পাথর গুড়া হয়ে যায় । এই খন্দকের যুদ্ধের সময় একদিন হুজুর ও ওমর আসরের নামায সূর্য্যাস্তের পরে আদায় করেন । এটা ছিল একটা স্নায়ু যুদ্ধ ।

হযরত আয়েশা (রাঃ) এর উপর মিথ্যা কলঙ্কঃ সাবান, ৬হিজরী, বনি মুসতালিক ঘটনার পর হুজুর দলবল সহ মদিনায় ফিরছেন, সাথে আয়েশাও আছেন । পথিমধ্যে কাফেলা এক যায়গায় রাত যাপন করছে । আয়েশা প্রাকৃতিক ডাকে কিছু দূরে যান । ফিরে এসে দেখেন তার নেকলেস নাই । তিনি আবার সেখানে যান । এবার ফিরে এসে দেখেন কাফেলা রওনা হয়ে গেছে । তিনি সেখানে শুয়ে পড়েন । পিছন থেকে আসা সাফওয়ান বিন মুয়াত্তাল আয়েশাকে চিনতে পারেন ও নিজে হেঁটে উনাকে উটে চড়িয়ে নিয়ে আসেন, পথে তার সাথে কোন কথা পর্যন্ত হয়নি । কিন্তু দলের লোকজন কানাঘুষা শুরু করে দিলো, আয়েশার নামে মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে দিলো । আয়েশা অসুস্থ হয়ে পড়লেন, হুজুরও চিন্তায় পড়ে গেলেন । আয়েশার নিস্কলঙ্কতা প্রমান করতে আয়াত নাযিল হলো-

''যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল ।'' - ১১, সূরা- আন নূর ।

হুদায়বিয়ার সন্ধিঃ জিলকদ, ৬ হিজরী, হুজুর (সাঃ) স্বপ্নে দেখলেন তিনি মক্কায় কাবা তোয়াফ করছেন । এর পর ১৫০০ মুসলমান নিয়ে রওনা হলেন ওমরাহ্ করার জন্য । যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছা তাদের নাই, তবে তলোয়ার সাথে রাখলেন যদি দরকার পড়ে যায় । খবর মক্কায় পৌঁছুলো । তারা যে কোন ভাবে প্রতিহত করার জন্য তৈরী হয়ে গেল । মুসলমানরা হুদায়বিয়ায় এসে তাঁবু গাড়লেন । কুরাইশদের দূতের কাছে হুজুর বললেন আমাদের যুদ্ধের কোন ইচ্ছা নাই, আমরা শুধু ওমরাহ্ করতে এসেছি । হুজুর ওসমানকে পাঠালেন কুরাইশদের কাছে । ওসমান তাদেরকে বললেন আমরা ওমরাহ্ করবো এবং ফেরৎ চলে যাব, যুদ্ধের কোন ইচ্ছা আমাদের নাই । কুরাইশরা কিছু না বলে উনাকে আটকিয়ে রাখলো । এদিকে ওসমান সময় মত না ফিরলে মুসলমানরা মনে করলো তারা হয়তো ওসমানকে মেরে ফেলেছে । ঘটনা এমন হলে তার পূর্ণ প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এক গাছ তলায় বসে হুজুর সহ সবাই বাইয়াত করলেন । এই বাইয়াতের সময় হুজুর নিজের বাম হাতকে ওসমানের হাতের পরিবর্তে ব্যবহার করেন । এই ঐতিহাসিক বায়াতকে 'বাইয়াত আর-রেদোয়ান' বলা হয় । তখন কুরআনের আয়াত নাযিল হয়-

''আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল ।''

-১৮,সূরা আল-ফাততহ্ ।

এই বায়াতের খবরে কাফেররা ভিত হয়ে গেল ও সন্ধিতে আসতে রাজি হলো । সন্ধির চুক্তিগুলো ছিল-

(১) এবার মুসলমানরা ফেরত যাবে, পরবর্তী বছর আসবে তবে মক্কায় ৩ দিনের বেশী থাকতে পারবে না ।
(২) তারা তলোয়ার ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র আনতে পারবেনা ।
(৩) আগামী ১০ বছর কেউ কারো গায়ে হাত তুলবে না ।
(৪) কুরাইশদের কেউ মুহম্মদের কাছে গেলে তারা তাকে ফেরত পাঠাবে, কিন্তু মুসলমান কেউ মক্কায় আসলে তারা তাকে ফেরত দেবে না ।
(৫) যে কেউ মুহম্মদের দলে বা কুরাইশদের দলে যোগ দেয়ার ব্যাপারে তাদের স্বাধীনতা থাকবে ।

এই চুক্তিতে লেখা 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম' এর ব্যাপারে ও হুজুরের নামের সাথে আল্লাহ্র রসূলের ব্যাপারে কাফেররা আপত্তি তোলে । মুসলমানরা এটার ব্যাপারে কোন সমঝোতায় যেতে রাজী ছিল না । কিন্তু হুজুর বৃহত্তর সার্থে নিজের হাতে ঐ পরিবর্তনগুলো করেন । এই চুক্তির পর হুজুর যখন সবাইকে কুরবানী করার হুকুম দিলেন সবাই অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন । এঅবস্থায় উম্মে সালমা হুজুরকে বলেন আপনি নিজের কুরবানী দিয়ে দেন ও মাথা মুন্ডিয়ে ফেলেন । হুজুর তাই করলেন , দেখাদেখি সব সাথী উনাকে অনুসরন করলেন । এখানে কুরআনের (২:১৯৬), (৬০:১০) ও (৬০:১২) আয়াত নাযিল হয় ।

এই চুক্তির পরে মুসলমানদের সংখ্যা জোরে সোরে বাড়তে শুরু করে । হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় সেখানে উপস্থিতি সংখ্যা ছিল ১৪০০ দু'বছর পর মক্কা বিজয়ের সময় এ সংখ্যা ছিল ১০ হাজার । চুক্তির ৪ নং শর্ত তাতক্ষনিক ভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মনে হলেও বাস্তবে এটা কাফেরদেরই বিপক্ষে যায় ও তারা নিজেরাই পরবর্তীতে এই চুক্তি সংশোধনে বাধ্য হয় । ৭ হিজরীর প্রথম দিকে মক্কার ৩ জন নেতা আমর বিন আল-আস, খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ ও উসমান বিন তালহা ইসলাম গ্রহন করেন ।

আরবের বাইরে ইসলাম প্রচারঃ আরবের বাইরে বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানদের ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি লিখার নিমিত্তে ৬ হিজরীর শেষ দিকে একটি সীল মোহর বানান হয় । যাতে লেখা থাকে محمد رسول الله
৬ হিজরীর শেষে অথবা ৭ হিজরীর প্রথমে আবিসিনিয়ার রাজা নেগাস এর কাছে নিম্নলিখিত চিঠি পাঠান হয় -

''আল্লাহ্র নামে শুরু করছি যিনি পরম দয়ালু ও মেহেরবান ।
আল্লাহ্র রসূল মুহম্মদের কাছ থেকে আবিসিনিয়ার (ইথিওপিয়া) বাদশা নেগাস এর কাছে ।

তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক যিনি সত্য পথের অনুসারী । আমি সেই আল্লাহ্র প্রসংশা করছি, যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই, যিনি সার্বভৌম, পবিত্র, শান্তির আধার, শান্তি দাতা, অভিভাবক ও নিরাপত্তা দাতা । আমি স্বাক্ষী দিচ্ছি মেরীর পুত্র জিসু (ঈসা) আল্লাহ্র নবী এবং সতী ও পবিত্র মেরীই জিসুর জন্মদাত্রী । আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন তার ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে যেমন তিনি নিজ হাতে আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন । আমি আল্লাহ্র রসূল আপনাকে সেই এক আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করছি যার কোন শরীক নাই । আমি আপনাকে আহ্বান করছি আল্লাহ্র আনুগত্যের জন্য আর আমাকে ও আমার উপর যা নাযিল হয়েছে তা অনুস্বরনের জন্য । আমি মহান ও সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্র দিকে আপনাকে আমন্ত্রন জানাচ্ছি । আমি স্বাক্ষী থাকছি যে আমি আপনার কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছিয়েছি । আমার উপদেশ গ্রহনের জন্য আমি আপনাকে আহ্বান করছি । তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক যে সত্য পথের অনুসারী ।''

পরবর্তীতে বাদশা নেগাস হুজুরের বরাবরে এ চিঠির উত্তর লিখে পাঠান । এখানে শুধু উপরোক্ত একটি চিঠিই নমুনা হিসেবে দেওয়া হলো । এ সময় তিনি আরো বহু চিঠি বহু দেশে পাঠান । তিনি মিশরের মুকাওকাস, পারস্যের

কোসরোস, রোমের কাইসার, বাহ্‌রাইনের মুনধির বিন সাওয়া, ইয়ামামার হাউধা বিন আলী, দামাসকাসের আবি শামির, ওমানের যাইফার ও আব্‌দ্‌ এছাড়া আরো বহু রাজা বাদশার কাছে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে চিঠি পাঠান । এদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম গ্রহন করেন ।

খাইবার এর যুদ্ধঃ মুহররম, ৭ হিজরী । এই এলাকা মদিনা থেকে ৬০-৮০ মাইল দূরে অবস্থিত । এখানকার অধিবাসী ইহুদী ও নায্‌দ বংশ । এ যুদ্ধে মুসলমানদের চরম বিজয় হয় । এক পর্য্যায়ে মুসলমানরা খ্যাদ্যাভাবে পড়ে । তখন তারা গাধা জবাই ক'রে রান্না করে কিন্তু হুজুর তা হারাম ঘোষনা করেন এবং তা ফেলে দেওয়া হয় । এ বিজয়ের পর ফসল ফলিয়ে অর্ধেক ভাগ নেওয়ার শত্রু পক্ষের প্রস্তাবে হুজুর সম্মতি দেন । ওমর বলেন খাইবার বিজয়ের আগে আমরা কোন দিন পেট পুরে খাইনি । খাইবার যুদ্ধের পরে এক ইহুদি মহিলা জয়নব বিন্‌ত্‌ আল হারিথ হুজুরকে বিষ মিশান ভেড়ার রোষ্ট খেতে দেয় । হুজুর মুখে দিয়েই তা টের পান । পরবর্তীতে সে মহিলা স্বীকার করে যে তাতে বিষ মিশানো ছিল । এই যুদ্ধের সমসাময়ীক সময়ে বিখ্যাত হাদিস সংরক্ষক আবু হুরায়রা (রাঃ) ইসলাম গ্রহন করেন ।

ওমরাহ্‌ (ছোট হজ্জ)ঃ জিলকদ, ৭ হিজরী । এ বছর হুজুর (সাঃ) ২ হাজার মুসলমান সাথে নিয়ে ওমরাহ্‌ পালন করেন । এ সময় মক্কার ৮ মাইল দূরে ২০০ জন ও অস্ত্রসস্ত্র রেখে যান । তারা মক্কায় ৩ দিন অবস্থান করেন । এ ওমরাহ্‌ ছিল শান্তিপূর্ন ।

মুতার যুদ্ধঃ জামাদি উল উলা, ৮ হিজরী, সেপ্টেম্বর , ৬২৯ ইংরেজী । বার্তা বাহক দূতকে মেরে ফেলার প্রতিবাদে মুসলমানদের মাত্র ৩ হাজার সৈন্য বাইজানটাইনের ২ লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ।

মক্কা বিজয়ঃ সাবান, ৮ হিজরী আল ওয়াতির নামক স্থানে বানু বকর্‌ (কুরাইশদের দল) বানু খুজাহ্‌ (মুসলমান) গোত্রের উপর হামলা করে যাতে রাতের অন্ধকারে কুরাইশরা সম্মক সাহায্য করে । অর্থাৎ তারা হুদায়বিয়ার সন্ধি লংঘন করে । বানু খুজাহ্‌ মুসলমানদের যাহায্য চাইল । হুজুর কাফেরদের ৩ টি শর্ত দিলেন-

(ক) খুজাহ্‌ নিহতদের রক্তমূল্য পরিশোধ করা
(খ) বানু বকর্‌ এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা
(গ) হুদায়বিয়া সন্ধি প্রত্যাহার করা

তাদের নেতা আবু সুফিয়ান হন্ত দন্ত হয়ে মদিনায় সরাসরি তার মেয়ে উম্মে হাবিবার (হুজুরের স্ত্রী) ঘরে গেলেন । কিন্তু তিনি হুজুরের বিছানায় বসতে গেলে তার মেয়ে বিছানা গুটিয়ে ফেলেন । সুফিয়ান জিজ্ঞেস করে আমার সন্তান, তুমি কি আমাকে বিছানার নাকি বিছানাকে আমার যোগ্য মনে কর না । তিনি বলেন এটা আল্লাহ্‌র রসূলের বিছানা, আর তুমি একজন নাপাক পৌত্তলিক । সুফিয়ান সন্ধি পূনর্বহাল করার জন্য মদিনার নেতাদের কাছে ধর্না দিয়ে ব্যার্থ হয়ে মক্কায় ফেরে ।

১০ই রমজান, ৮ হিজরী ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে হুজুর রওনা দিলেন মক্কার উদ্দেশ্যে । মদিনার দায়ীত্বে রইলেন আবু রুহ্‌ম্‌ আল গিফারী । মুসলমানরা যখন আল যুহ্‌ফায় পৌঁছুলো তখন আল আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব ও আল আবওয়ায় আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহন করলো । হুজুরের চাচা আব্বাস আবু সুফিয়ানকে বললেন তুমি তোমার দল বল নিয়ে হুজুরের কাছে আত্মসমর্পন করো অন্যথায় তোমাকে দ্বিখন্ডিত করা হবে । হুজুর বললেন এখনও কি সময় হয়নি এক আল্লাহ্‌কে ও তার রসূলকে স্বীকার করার ? এমন সুযোগের মূহুর্তেও অত্যন্ত নরম সূরে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে মহানুভবতার এক চরম দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলেন আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) । মঙ্গলবার, ১৭ই রমজান, ৮ হিজরী হুজুর সামনে রওনা হলেন । ডান প্রান্তের দায়িত্ব দিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদকে, বাম প্রান্তে আজ্‌ জুবাইর বিন আওয়াম, ইনফ্যান্ট্রির দায়িত্বে উবাইদাহ্‌ । খালিদ বিন ওয়ালিদ ১২ জনকে হত্যা করে শহরের কেন্দ্রে ঢুকে গেলেন , ২ জন শহীদও হলো । আজ্‌ জুবাইর তার গন্তব্য আল ফাথ এ পৌঁছুলেন ও হুজুরের জন্য অপেক্ষ করতে থাকলেন । সেখানে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডিন হলো । তাঁবু পাতা হলো। হুজুর সবাইকে নিয়ে এই মহান বিজয়ের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে শুকরানার নামায আদায় করলেন । তবে তিনি এখানে বেশী দেরী করলেন না । সোজা কাবায় গেলেন , যেখানে তখনো ৩৬০টি মুর্তি ছিল। হুজুর নিম্নের আয়াত তেলাওয়াত করতে করতে সবগুলোকে ভেংগে চুরমার করে দিলেন ।

''বলুনঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে । নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল ।'' - ৮১, সূরা বনী ইসরাঈল ।

কাবার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষনের পর হুজুর এই আয়াত তেলাওয়াত করেন-

''হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও । নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন । '' - ১৩,সূরা আল-হুজুরাত ।

হুজুর ঘোষনা দিলেন কাবার চাবির দায়িত্ব ও হাজীদের পানি বিতরনের দায়িত্ব চিরদিনের জন্য উসমান বিন তালহা

ও তার বংশের উপরই থাকবে। বিলাল কাবার উপরে উঠে নামাযের জন্য আযান দিলেন। ইকরিমা বিন আবু জেহেল (যে মক্কায় ঢুকতে বাধা দিয়েছিল), ওয়াহ্সী (হামজাকে হত্যা করে) ও হিন্দকে (হামজার কলিজা চিবায়) ক্ষমা করে দেওয়া হলো। মক্কার দু'জন নেতা সাফওয়ান বিন উমাইয়াহ্ ও ফুদালাহ্ বিন উমাইর কে হুজুর মাফ করে দেন। কাবা তোয়াফের সময় ফুদালাহ্ হুজুরকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। হুজুরের এই নজির বিহীন ক্ষমা প্রদর্শন কট্টর পন্থি বিশ্বায ঘাতককেও চরম বিশ্বাসীতে পরিনত করে। তিনি বলেন ''যারা আল্লাহ্কে এবং পরবর্তী জীবনকে বিশ্বাস করে তাদের উচিত তাদের ঘরের সমস্ত মুর্তি ভেঙ্গে ফেলা''। তিনি উজ্জা ও মানাত নামের মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলার ব্যাবস্থা করেন। মক্কা বিজয়ের সময় হুজুর ১৯ দিন মক্কায় ছিলেন। তিনি মক্কায় ওমরাহ্ পালন করলেন। ইটাব বিন উসাইদকে মক্কার গভরনর নিযুক্ত করলেন। জিলকদের শেষ ছয় রাত্রির মধ্যে, ৮ হিজরী তিনি মদিনায় ফেরত আসলেন। ৮ বছর আগে ভীত মুহাজির হিসেবে তিনি প্রথম মদিনায় আসেন, আজ তিনি আবার মদিনায় আসলেন যখন মক্কা তার হস্তগত।

তাবুক এর যুদ্ধঃ রজব, ৯ হিজরী।এই যুদ্ধেই মুসলমানদের কাছ থেকে যাহায্য চাওয়া হয়। ওসমান (রাঃ) ৯০০ উট, ১০০ ঘোড়া, ২০০ আউন্স সোনা ও ১০০০ দিনার দেন। আব্দুর রহমান বিন আউফ ২০০ আউন্স চাঁদি দেন। আবু বকর (রাঃ) তার বিষয় আসয় সব কিছুই এই যুদ্ধের সময় দিয়ে দেন। ওমর তার সম্পত্তির অর্ধেক দান করেন। এ ছাড়াও আল আব্বাস, তালহা, সাদ বিন উবাদা, মুহম্মদ বিন মাসলামাহ্ ও আরো অনেকে বহু কিছু দান করেন। বৃহস্পতিবার আল্লাহ্র রসূল ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে তাবুকের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এর আগে কোন যুদ্ধে এত সৈন্য সমাবেশ ঘটেনি। অথচ সরঞ্জাম ছিল খুবই নগন্য। প্রতি ১৮ জন সৈন্যের মাত্র একটি করে উট। এক পর্য্যায়ে তাদের গাছের পাতা খেতে হয়, এমনকি উট জবাই করে তার থলের পানি খেতে হয়। এক সময় সাথীরা পিপাশায় অতিষ্ট হয়ে গেলে রসূল (সাঃ) আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেন তখন বৃষ্টি হয়। মুসলমানদের এই অভিযানের কথা শুনে বাইজানটাইন দল ভীত হয়ে পড়ে ও দূত ইয়াহ্না বিন রাওবাহ্ কে পাঠিয়ে হুজুরের সাথে শান্তি চুক্তি করে ও জিজিয়া কর দিতে রাজী হয়। পথিমধ্যে ১২ জন বিশ্বাস ঘাতক হুজুরের জীবন নাশের চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। এই যুদ্ধে হুজুর রওনা হন রজবে আর ফিরে আসেন রমজানে, এতে মোট ৫০ দিন ব্যায় হয়, তারমধ্যে তাবুকে ২০ দিন কাটে। হুজুর কর্তৃক এটাই ছিল শেষ যুদ্ধ। তাবুকের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সূরা আত-তওবার অনেক আয়াত নাজিল হয়। হুজুরের জিবদ্দশায় ছোট বড় সব মিলিয়ে প্রায় ২৬ টি যুদ্ধ হয়। এগুলো হলো- বদর, আল-কুদর, বনি কায়নুকা, আস্সাওইক, ধী আমর্ , বুহরান, ওহুদ, হামরা আল আসাদ, আবি সালামা, আর রাজি, মাউনা কূপ, বনি আন নাদির, নায্দ্ , বদর ২য়, দৌমাত আল যনদল, আল আহ্যাব, বানু কুরাইজা, বনি লিহিয়ান, বনি আল মুসতালিক, ধু কারাদ, খাইবার, ধাত উর রিকা, মুতা, মক্কা বিজয়, হুনাইন ও তাবুক।

মানুষের দলে দলে ইসলামে যোগদানঃ দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কা বিজয় করা হয়, অথচ এর এক বছরের কম সময়ের মধ্যে তাবুকের যুদ্ধের সময় এই সংখ্যা দঁড়ায় ৩০ হাজারে, আর বিদায় হজ্জে হাজীদের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৪৪ হাজার। ইসলাম গ্রহনের জন্য বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিরা দলে দলে হুজুরের কাছে আসতে থাকে। এদের কিছু নাম হলো- আব্দুল কাইস, দাউস, ফারওয়াহ্, সুদা, কাব বিন জুহাইর, উদহারা,বালি, থাকিফ, হামদান, বানী ফাজারাহ্ ,নাযরান, বনী হানিফা, বনি আমির, তুকীব, তাই ও আরো অনেকে। আমাদের শেষ নবীকে অন্যান্য সকল নবীর উপরে প্রাধান্য দেবার কারন আল্লাহ্ পাক কুরআনে এ ভাবে বর্ননা করছেন-

''হে বস্ত্রাবৃত, রাত্রিতে দন্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে; অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম ''
- ১, ২, ৩, সূরা মুয্যাম্মিল।
''হে চাদরাবৃত, উঠুন, সতর্ক করুন '' - ১, ২,সূরা আল-মুদ্দাস্সির।

অতএব তিনি উঠেছেন ও সমগ্র মানব জাহানের মুক্তির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন ২০ এরও বেশী বছর ধরে।

বিদায় হজ্জঃ শনিবার জিলকদের শেষ চার দিনের এক দিন, ১০ হিজরী, হযরত মুহম্মদ (সাঃ) বিকালে তার উটনি আল-কাসওয়ায় চড়ে মদিনা থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। ৮ দিন ভ্রমনের পর ৪ জিলহজ্জ হুজুর মক্কায় পৌঁছুলেন। মসজিদ আল-হারামে প্রবেশ করেই তিনি প্রথমে তোয়াফ ও পরে সাফা মারওয়া সাঈ করলেন। হজ্জে কিরানের নিয়ত করেছেন বলে তিনি ইহ্রাম ছাড়েননি। তিনি আল-হাজুনে অবস্থান নেন। ৮ জিলহজ্জ হুজুর মিনায় রওনা দিলেন, ৯ তারিখ সকালে আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওনা হন। আরাফাতে নামিরায় হুজুরের তাঁবু পাতা হয়। আরাফাতের মাঠে তিনি উপস্থিত ১লক্ষ ৪৪হাজার হাজীর সামনে সমগ্র মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষন দেন।

বিদায় হজ্জে নবী করিম (সাঃ) এর ভাষনের কিছু অংশঃ
ও জনতা আমার কথা শুন। আমার জানা নাই এর পর এখানে তোমাদের সাথে আর কোনদিন আমার দেখা হবে কি না। মনে রেখ সমস্ত পৌত্তলিকতা ও অবাধ্যতার এখন অবসান হয়েছে।

ও জনতা, মহিলাদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করো। আল্লাহ্র নামে তোমরা তাদের গ্রহন করে থাক। দাম্পত্য অধিকার মেনে চলা তাদের দায়ীত্ব। তারা তা অমান্য করলে তাদের সংশোধনের জন্য মৃদু শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। এতে তারা তোমাদের অনুগত হয়ে গেলে মর্যাদার সাথে তাদের বস্ত্র ও খাদ্যের ব্যাবস্থা করবে।

আমি তোমাদের জন্য কুরআন ও হাদিস রেখে গেলাম একে আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনই বিচ্যুত হবেনা । তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র উপাসনা করবে, নামায, রোজা, যাকাত ও হজ্জ আদায় করবে এবং তোমরা যাদের দায়ীত্বে আছো তাদের আনুগত্য করবে, তাহলে তোমরা জান্নাতে যেতে পারবে ।

উপস্থিত জনতা বলে- আমরা সাক্ষী দিচ্ছি আপনি আপনার দায়ীত্ব পরিপূর্ণ করেছেন । হুজুর তখন বলেন- ও আল্লাহ্‌ তুমি সাক্ষী থেকো । তখন কুরআনের আয়াত নাজিল হয়-

‘‘আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ।’’ - ৩, সূরা আল-মায়েদা ।

ভাষনের পর বিলাল (রাঃ) আযান দেন । হুজুর এখানে জোহর ও আসর আদায় করেন । মাগরিবের পর মুজদালিফার উদ্দেশ্যে রওনা হন । মুজদালিফায় মাগরিব ও ঈশা আদায় করেন ও রাত যাপন করেন । পরদিন সকালে মিনায় যান । জামারায় ঠিল ছুড়ার পরে নিজ হাতে ৬৩ টি উট কুরবানী দেন, বাকি গুলো আলীকে জবাই করতে বলেন, সব মিলিয়ে ১৩৭ টি কুরবানী দেওয়া হয় । প্রত্যেক উট থেকে এক টুকরা করে গোশত নিয়ে তা রান্না করে তারা খান । এর পর মক্কা এসে জমজম্‌ এর পানি পান করেন । হুজুর ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ মিনায় অবস্থান করেন । ১৩ তারিখ রাত তিনি বনি কিনানার পাশে এক পাহাড়ে অবস্থান করেন । ১৪ তারিখ বিদায়ী তোয়াফ করেন ও মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান ।

আল্লাহ্‌র কাছে যাত্রাঃ

শেষ বিদায়ের লক্ষণঃ

- দশ হিজরীর রমজান মাসে ১০ দিনের পরিবর্তে ২০ দিনের এতেকাফে বসা
- জিব্রাইল (আঃ) অন্য বছরের ১ বারের পরিবর্তে হুজুরের (সাঃ) কাছ থেকে এই রোজায় ২ বার কুরআন শোনেন
- বিদায় হজ্জে হুজুর (সাঃ) বলেন আমি জানিনা এর পর এখানে আপনাদের সাথে আর দেখা হবে কিনা
- শেষ সূরা আন নসর এর অবতরন
- ১১ হিজরীর সফর মাসের প্রথম দিকে ওহুদ প্রান্তরে শহীদদের কবর যিয়ারত
- মাঝ রাতে জান্নাতুল বাকীতে গমন ও মৃতদের রুহের মাগফেরাত কামনা

সোমবার, ২৯ সফর ১১ হিজরী আল বাকী থেকে ফেরার পথে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) এর মাথা ব্যাথা ও জ্বর আরম্ভ হয় । প্রচন্ড জ্বরে হেড ব্যান্ড উত্তপ্ত হয়ে উঠে । এই অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি ১১ দিন নামাযের ইমামতি করেন । তিনি মোট ১৩ বা ১৪ দিন অসুস্থাবস্থায় কাটান । তিনি কোথায় অবস্থান করবেন এ ব্যাপারে তিনি স্ত্রীদের পরামর্শ চান এবং শেষ সপ্তাহ তিনি হজরত আয়েশা (রাঃ) এর ঘরে অবস্থান করেন । আয়েশা (রাঃ) সে সময় সুরা আল মায়েদা থেকে তেলাওয়াত করতেন । বুধবার মৃত্যুর ৫ দিন পূর্বে শরীরে অত্যন্ত জ্বর থাকায় তিনি পানির পাত্রে বসে মসজিদে যান । তখন তিনি বলেন আমার কবরকে তোমরা পূজা করবে না । যদি কেউ আমার কাছে কিছু পাওনা থাক বা আমি যদি কাউকে কোন কষ্ট দিয়ে থাকি আজ আমি উপস্থিত তোমরা বদলা নিয়ে নাও । উপস্থিত একজন তাঁর কাছে ৩ দিরহাম পেতেন তিনি তা তখন হুজুরের কাছে আদায় করে নেন । তিনি বলেন তোমরা আনসারদের সাথে ভাল ব্যাবহার করবে, তারা আমার পরিবার, তারা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে । তোমরা তাদের দোষ দেখবে না ।

আমি আবু বকরের সাথে সবচেয়ে বেশী নিরাপত্তা বোধ করি । এক আল্লাহ্‌ ছাড়া কারো সাথে বন্ধুত্ব করতে পারলে আমি তা আবু বকরের সাথেই করতাম । আবু বকর ছাড়া কারো জন্য এই মসজিদের দরজা খোলা থাকবে না । বৃহস্পতিবার, তখন মাত্র ৪ দিন বাকি তিনি মাগরিবের নামাযে ইমামতি করলেন । এই ছিল উনার শেষ ইমামতি । ইশার সময় মসজিদে যাবার জন্য তিনি বারবার চেষ্টা করেন, কিন্তু যতবারই ওঠেন সজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন, অবশেষে তিনি হজরত আবু বকর (রাঃ) কে নামাযে ইমামতি করার অনুমতি দেন । হুজুরের জীবদ্দশায় আবু বকর (রাঃ) মোট ১৭ নামাযে ইমামতি করেন । শনিবার অথবা রবিবার যখন মাত্র এক দুই দিন বাকি হুজুর কিছুটা সুস্থতা বোধ করলেন । দুজনের উপর ভর দিয়ে তিনি মসজিদে এলেন তখন জোহরের নামায রেডি হচ্ছে মাত্র, আবু বকর সরে দাঁড়াতেই তিনি ঈশারা করে উনাকে সেখানেই থাকতে বল্লেন । হুজুর (সাঃ) আবু বকরের বাম পাশে বসে নীচু স্বরে নামায পড়ালেন আর আবু বকর (রাঃ) উচ্চ স্বরে তকবীর বল্লেন । রোববার আর মাত্র একদিন - দাসদের মুক্ত করে দিলেন । নিজের ৭ দিনার দান করে দিলেন । যুদ্ধাস্ত্র মুসলমানদের দিয়ে দিলেন । সে রাতে লন্ঠন জ্বালানোর জন্য হজরত আয়েশা (রাঃ) কে তেল ধার করে আনতে হয়েছিল ।

সোমবার আজ শেষ দিন, ফজরের সময় হুজুর (সাঃ) আয়েশার জানালার পর্দা তুলে নামাজিদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছিলেন । তিনি আসবেন ও ইমামতি করবেন মনে করে হজরত আবু বকর (রাঃ) সরে দাঁড়ালেন । তিনি নামায পড়ানোর অনুমতি দিয়ে পর্দা ছেড়ে দিলেন । শেষবারের মত নামায দেখে চক্ষু শীতল করে নিলেন আমাদের প্রিয়

নবী, পরবর্তি নামাজের সময় পর্যন্ত তিনি আর জীবিত থাকেননি । সেদিন তিনি ফাতেমার কানে কানে বলেন- আমি আর আরোগ্য লাভ করবো না, আমার পরিবারের মধ্যে তুমি প্রথম আমার সাথে মিলিত হবে । শেষ বিচারে ফাতেমাই (রাঃ) সমস্ত মেয়েদের সর্দার হবেন ।

তিনি ফাতেমার প্রশ্নের জবাবে বলেন আজকের পর তিনি আর কোন কষ্ট পাবেন না । এ সময় তিনি হাসান হুসেনকে কাছে ডেকে চুমু দেন । হুজুর তার স্ত্রীদের দেখতে চান । আল্লাহ্‌কে স্মরন রাখার জন্য তিনি তাদের নির্দেশ দেন । এরপর উনার কষ্ট এত বেড়ে যায় যে খায়বারের বিষের কথা মনে পড়ে যায় । তিনি বলেন আমার মনে হয় মৃত্যু সমাসন্ন । এ সময় তিনি নামাযের হুকুম দিতে থাকেন ও চাকর বাকরদের প্রতি মনোযোগী হতে বলেন ।

তিনি হজরত আয়েশার (রাঃ) কোলে মাথা রাখেন ও উনার চিবান দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজেন । এর পর পানি দিয়ে মুখ মুছেন । তিনি বলেন- ‘‘আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, মৃত্যু বড় যন্ত্রণাদায়ক । এর পর বলেন- যাদের উপর তুমি রহমত বর্ষন করেছ তাদের কাছেই আমাকে নিয়ে যাও । ও আল্লাহ্‌ তুমি আমাকে মাফ করে দাও, আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও । তার কাছেই আমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে, তিনি সর্ব্বোচ্চ শক্তিশালী ও মর্যাদাশীল আল্লাহ্‌ । এর পর সোমবারের এই পড়ন্ত সকালে ১১ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল ৬৩ বছর ৪ দিন বয়সে আল্লাহ্‌র হাবীব, আমাদের প্রান প্রিয় নবী দোজাহানের সরদার হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) ইহ জগত থেকে চির দিনের জন্য বিদায় গ্রহন করেন । ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন ।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন- এর চেয়ে আনন্দ দায়ক আর উজ্জল দিন কি হতে পারে যেদিন প্রিয় নবী (সাঃ) পৃথিবীতে এসেছিলেন, আর এর চেয়ে বেদনা দায়ক ও অন্ধকারাচছন্ন দিন কি হতে পারে যেদিন তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন ।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলেন- ও আব্বা যার ডাকে আল্লাহ্‌ সাড়া দিতেন ! ও আব্বা যার গন্তব্য জান্নাত, আমি কাকে তার মৃত্যু সংবাদ দেব ।

সজ্ঞাহীন প্রায় হযরত ওমর (রাঃ) শোক বিহব্বল হয়ে বলেন- কিছু ভন্ড বলে বেড়াচেছ যে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) মারা গেছেন । তিনি মোটেই মারা যাননি, তিনি ফিরে আসবেন এবং তখন ভন্ডদের হাত পা কেটে দেবেন ।

হযরত আবু বকর (রাঃ) আসেন এসে হুজুরের মুখের চাদর তুলে তাঁকে চুমু দেন ও বলেন আপনি আল্লাহ্‌র আদেশে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করেছেন । তিনি বাহিরে এসে নীচের আয়াত তেলাওয়াত করে শুনান ।

‘‘আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয় । তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন । তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহ্‌র কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না । আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ্‌ তাদের সওয়াব দান করবেন ।’’

- ১৪৪, সূরা আল-ইমরান ।

এই আয়াত শুনা মাত্র হযরত ওমর (রাঃ) চকিত ফিরে পান ও স্বীকার করেন যে আমাদের প্রিয় নবীজ্বী সত্যি মারা গেছেন । এর পর খলিফা নির্ধারনের কাজে কিছুটা সময় লাগে । হযরত আবু বকর (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হন । মংগলবার হুজুর (সাঃ) কে কাপড় পরিহিত অবস্থায় গোসল দেওয়া হয় । আল আব্বাস, আলী আল ফজল, কাশেম, শাকরান, ওসামা বিন জাইদ এবং আস বিন খাউলী (রাঃ) হুজুর কে গোসল দেন । হুজুর বলেন- নবীরা যেখানে মৃত্যুবরণ করেন সেখানেই তাদের কবর হয় । সে অনুযায়ী মংগলবার দিনগত রাত্রে হুজুরকে তাঁর গৃহেই দাফন করা হয় , যা আজও পর্যন্ত মসজিদে নববীর অভ্যন্তরে সবুজ গম্বুজের নীচে বেহেশতের এক অংশ হিসাবে চির মহিমাময়।

৯তম মাহফিল
৪০৭-৭১ থর্নক্লিফ পার্ক ড্রাইভ
রবিবার, ১৮ই এপ্রিল, ১৯৯৯
১লা মুহররম, ১৪২০
৫ই বৈশাখ, ১৪০৬